ইতিকথা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০২১ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২১২-২৩০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

চটকল শ্রমজীবীদের আর্থসামাজিক জীবন: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭-২০১১)

শত্রুঘ্ন কাহার*

(প্রাপ্ত: ৯ আগস্ট ২০১৯ খ্রি., গৃহীত: ২০ মার্চ ২০২০ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে রিষড়ায় চটকল স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলার অর্থনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এই চটশিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলায় গড়ে ওঠে এক নতুন শ্রেণি— 'শ্রমিক শ্রেণি'। চটশিল্প স্থাপনের প্রথম কুড়ি বছর বাংলার স্থানীয় অধিবাসীরাই এই শিল্পের শ্রমিক চাহিদা পূরণ করলেও ধীরে-ধীরে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে অভিবাসী শ্রমিকরা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলায় জড়ো হতে থাকে এবং কালক্রমে এই অবাঙালি শ্রমিকরাই চটশিল্পের প্রাণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এই অবাঙালি চটকল শ্রমিকদের আর্থসামাজিক জীবনে এক দ্বৈতসত্তা অর্থাৎ অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক চরিত্র একাধিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এদের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সংগঠিত হতে থাকে। ৬০-এর দশক থেকেই এদের দ্বৈতসত্তার অবসান ঘটতে থাকে। এরা বাংলায় স্থায়ী শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে। কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে, চটশিল্পের ওপর জীবিকানির্বাহের জন্য এরা সম্পূর্ণ নির্ভর হয়ে পড়লে এদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র আন্দোলন নজরে পড়ে। এইসময় তাদের একটি সুসংগঠিত শ্রমিকশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়। কিন্তু ৯০-এর দশক থেকে বিশ্বায়নের কুপ্রভাব এই চটশিল্পের ওপরও পড়ে, ফলে চটকল শ্রমিকদের আর্থসামাজিক জীবনে নেমে আসে এক অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ডেবরা থানী শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়।
e-mail: skahar0072015@gmail.com

আসার জন্য চটকল শ্রমিকদের অনেকেই চটকলের কাজের পাশাপাশি অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের এই চটকল শ্রমিকদের বেঁচে থাকার তাগিদে আর্থসামাজিক জীবনে ক্রমাগত পরিবর্তনকে তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

সূচকশব্দ

চটকল, দ্বৈতসত্তা, বিশ্বায়ন, অর্থনৈতিক, অভিবাসী, সংগঠিত, বিবর্তন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার হুগলি নদীর উভয় তীরে চটকল স্থাপনের মধ্য দিয়ে যে শিল্পায়ন ঘটে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শস্য-শ্যামল' বাংলার কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে যন্ত্রনির্ভর শিল্প অর্থনীতির, যা রচনা করে শোষণ-নিপীড়ন-অত্যাচারের এক নতুন অধ্যায়। এই শিল্প গড়ে ওঠার পর প্রথম কুড়ি বছর স্থানীয় বাঙালি শ্রমিকরাই এই শিল্পের চাহিদা পূরণ করত। কালক্রমে এদের স্থান নিতে থাকে পার্শ্ববর্তী রাজ্যের অবাঙালি শ্রমিকেরা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি অফিসার বি. ফলি-র বিবরণ এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের এই অভিবাসী শ্রমিকেরা বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন ধারা যুক্ত করে।[১]

স্বাধীনতা-উত্তর এই চটকল শ্রমিকদের আর্থসামাজিক জীবনে পরিবর্তন বোঝার জন্য স্বাধীনতার পূর্বে এদের আর্থসামাজিক জীবনের চরিত্র বুঝতে হবে। ১৮৯০-এর পর বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা থেকে দলে-দলে শ্রমিকেরা এই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিড় করতে থাকে। একাধিক ঐতিহাসিক এই পর্বে এই শ্রমজীবীদের মধ্যে 'Dual chracter' অর্থাৎ অর্ধ-কৃষক--অর্ধ-শ্রমিক চরিত্র লক্ষ করেছেন। সুতরাং ইউরোপে শিল্পায়নের ফলে যেমন একটি সর্বহারা শ্রেণি গড়ে ওঠে, বাংলার ক্ষেত্রে আরও স্পষ্টভাবে বললে ভারতের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এই শ্রমজীবীরা বাংলার চটকলে শ্রমিকরূপে কাজ করলেও গ্রামে এদের অধীনে স্বল্প পরিমাণে হলেও কিছু জমি ছিল। সম্ভবত তাই প্রথম চার দশক অর্থাৎ ১৯৩০ পর্যন্ত লকআউট, ছাঁটাই ও বেতনের পরিমাণ কম হলেও এরা কিন্তু সংগঠিত সংগ্রামে যায়নি। যখনই এ-ধরনের ঘটনা ঘটত তারা নিজ-নিজ গ্রামে চলে যেত এবং সেখানে চাষবাসে নিযুক্ত হয়ে পড়ত। দ্বিতীয়ত, এই পর্বে এই সমস্ত শ্রমজীবীদের ওপর সর্দারদের প্রভাব ছিল অনুধাবনযোগ্য। অমল দাসের প্রবন্ধ 'চটকলের শ্রমিকদের ওপর সর্দারি প্রভাব (১৮৭৫-১৯২০)' এক্ষেত্রে

উল্লেখ্য। এই সর্দাররাই ছিল বাংলায় এই অভিবাসী শ্রমজীবীদের জীবনের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। অর্থাৎ বাংলায় এদের আসার পর এদের জন্য বাসস্থান, কাজ না পাওয়া পর্যন্ত খাইখরচ, সর্বোপরি কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রধান মাধ্যমও ছিল এই সর্দাররা। তবে এর পরিবর্তে সর্দাররা এই শ্রমজীবীদের কাছ থেকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করত যা রয়াল কমিশন রিপোর্টে উপহার, কর, নজরানা নামে পরিচিত।[২] তৃতীয়ত, চটকল শ্রমজীবীরা সপরিবার এই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে না থাকার দরুন তাদের আয়ের এক নির্দিষ্ট অংশ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য গ্রামে পাঠাত।[৩] সুতরাং বাংলার স্থানীয় অর্থনীতিতে এদের প্রভাব পড়েছিল সামান্য। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে বাংলায় এদের জীবন কোনো নরককুণ্ড থেকে কম ছিল না। বিহার, উত্তরপ্রদেশের গ্রাম্য জীবন ছেড়ে, বাংলায় এসে এরা ঘিঞ্জি-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে থাকে। মিলের তৈরি ছোট-ছোট কোয়ার্টাস বা মিল-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্দার নির্মিত অথবা বেসরকারি জমির মালিকদের তৈরি বস্তিতে এই শ্রমজীবীদের বসবাস করতে হত। এই সমস্ত বস্তিতে না ছিল পরিষ্কার জল সরবরাহের ব্যবস্থা, না ছিল সুস্থ পরিবেশ। বাসস্থানের দুঃসহ অবস্থা, মিলের হাড়ভাঙা খাটুনি, কাজের ঘৃণ্য পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর বস্তি জীবনের সঙ্গে শ্রমিকদের জীবনে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ। বাৎসরিক ফ্যাক্টরি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, মিল মালিকগণ শ্রমিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন না। কেবলমাত্র কলেরা, টাইফয়েড, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি মহামারির প্রকোপ দেখা দিলে তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়তেন। কারণ তখন চটকলের উৎপাদন বিশেষভাবে ব্যাহত হত।[৪]

চটকল শ্রমিকদের এই নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চিত জীবন ও সামগ্রিক অসহায় অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছিল তাদের সামাজিক জীবন ও অভ্যাসে। জুয়া খেলা, মদ খাওয়া ইত্যাদি ছিল তাদের জীবনের অন্যতম প্রধান বিষয়। উক্ত সময়কালে এই সমস্ত অঞ্চলে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হারে ব্যাপক পার্থক্য ও পুরুষ-শ্রমিকদের প্রাধান্য চটকল শ্রমিকদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করেছিল। যৌন অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। রয়াল কমিশন অন লেবার-এর সামনে শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে মতামত জানাতে গিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ড. ব্যাটরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা থেকে যৌন অপরাধের মাত্রা যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তা জানা যায়। ড. কার্জেল ১৯১২-২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ৭৬টি চটকল পরিদর্শন করে যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায়, যে কিছু অভিবাসী শ্রমিক, মাদ্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলার চটকলে কাজ করতে এসেছিল তারা অধিকাংশই তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক নিয়ে এসেছিল। এই স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকেই চটকলে কাজ

করত। কিন্তু এই অভিবাসী শ্রমিকরা প্রতিদিন রাতে যাদের সঙ্গে বসবাস করত বহুক্ষেত্রে তারা তাদের স্ত্রী ছিল না।[৫]

কিন্তু যে-কোনো সমাজ বা গোষ্ঠী তার আপন প্রবাহে প্রবাহিত হয়, হয়তো কারও গতি দ্রুত, কারও বা মন্থর। আমরাও এই চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে পরিবর্তনের এক ধারা লক্ষ করতে পারি যদিও এই পরিবর্তনের যারা ছিল খুবই মন্থর ও সময়সাপেক্ষ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ আগস্ট অভিশপ্ত দেশভাগের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হল বাংলাকে। বাংলা ভাগের ফলে কৃষিপ্রধান অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পাটকল সমৃদ্ধ অঞ্চল পশ্চিম বাংলার মধ্যে। ফলে এই কারখানাগুলিতে কাঁচামাল জোগান এক বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কাঁচামালের এই অভাবের সঙ্গে যুক্ত হয় আধুনিকতার আঘাত। স্বাধীনতার পর দেশীয় পুঁজিপতিদের হাত ধরে 'পরিমার', 'পলিব্যাগ' ভারতীয় বাজার ক্রমশ দখল করতে থাকে যার প্রভাব এসে পড়ে পাটশিল্পের ওপর।[৬] এরই সঙ্গে চটকলে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের জীবনেও ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রথমত, তাদের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে যা প্রভাব ফেলে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে।

স্বাধীনতা-উত্তর এই চটকল শ্রমজীবীদের আর্থসামাজিক জীবনের বিবর্তনের ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। এগুলি হল যথাক্রমে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত প্রথম পর্ব, যখন তাদের প্রাক্-স্বাধীনতা চরিত্র অক্ষুণ্ণ ছিল, অর্থাৎ অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক চরিত্রে দ্বৈতসত্তা এ-পর্বেও সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে ১৯৬৭ থেকে ১৯৯০-এর সময়কালকে চিহ্নিত করা যায়। এ পর্বে এদের চরিত্রের দ্বৈতসত্তা ক্রমশ ম্লান হতে থাকে এবং এরা বাংলার স্থায়ী বাসিন্দাতে রূপান্তরিত হতে থাকে। ১৯৯০ থেকে ২০১১ সময়কালকে তৃতীয় পর্ব রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সময়পর্বে বিশ্বায়নের কুপ্রভাবে চটকল শ্রমজীবীরা ক্রমশ মিলের সংগঠিত শ্রমিক থেকে অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর প্রথম দুই দশক তাদের জীবনে পরিবর্তন ছিল ক্ষীণ, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী লক্ষণগুলি মোটামুটি বজায় ছিল। এই পর্বে চটকল শ্রমিকদের আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাদের Dual chracter অর্থাৎ অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক চরিত্র বজায় ছিল। কারখানাগুলো স্বাধীনতার পর স্বদেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে এলেও শ্রমিকের অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এ-পর্বেও চটকল শ্রমিকদের নির্দিষ্ট মজুরির হার নির্ধারণ করা কঠিন। এ-ব্যাপারে উপযুক্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের যথেষ্ট অভাব আছে। বিভিন্ন চটকলে বিভিন্ন মজুরির

হার বজায় ছিল। এমনকি একই কাজের জন্য বিভিন্ন চটকলে বিভিন্ন ধরনের মজুরির নজির পাওয়া যায়। এছাড়া জরিমানা, ঋণবাবদ চড়া সুদ, সর্দারকে উৎকোচ প্রদান প্রভৃতি বিষয় এ-পর্বেও শ্রমিকদের নির্দিষ্ট মজুরির হার নির্ধারণ জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের দিয়ে প্রাপ্তবয়স্কের কাজ করিয়ে নেওয়া হত; কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক বা মহিলা শ্রমিকের বেতনের তুলনায় তাদের বেতন অনেক কম ছিল। শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করলেও তাদের মজুরির হার অত্যন্ত মন্থর গতিতেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে প্রাপ্ত মজুরিতে তাদের যেনতেন জীবননির্বাহ করতে হত।[৭]

এই সময়পর্বে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়েছিল। দেশভাগ উদ্‌বাস্তু সমস্যা প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি-তে ১৯৪৭-এ বিভাজন এবং কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত আইএনটিইউসি-র প্রধান্য বৃদ্ধির ফলে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তেমন কোনো বড় ধর্মঘট সংগঠিত হয়নি।[৮] অপরদিকে চটকল শ্রমিকদের চরিত্রগত অর্থাৎ অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক চরিত্রের পরিবর্তন না ঘটায় তাদের কাছে চটকল থেকে প্রাপ্ত আয় পরিবার চালানোর জন্য প্রধান উৎস বলে মনে হয়নি। গ্রামের কৃষিকাজই তাদের আয়ের প্রধান উৎস হওয়ায় তারা মজুরি বৃদ্ধির দাবি নিয়ে সংগ্রামের পথে হাঁটেনি। মজুরি নিয়ে যখনই কোনো ধর্মঘট বা আন্দোলন হত তখন স্থানীয় ইউনিয়ন নেতা বা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে মিল খোলার খবর পেয়ে এরা ফিরে এসে আবার চটকলের কাজে যোগ দিত। সুতরাং চটকলের বিকল্প হিসেবে গ্রামে চাষবাসের কাজ মজুত থাকায় এরা সক্রিয়ভাবে ধর্মঘটে যোগ দিত না।

সারণি ১: ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সদস্যপদ (১৯৫১-১৯৬৭)

বছর	আইএনটিইউসি		এআইটিইউসি		এইচএমএস		ইউটিউইসি	
	অনুমোদিত ইউনিয়ন	সদস্য সংখ্যা	অনুমোদিত ইউনিয়ন	সদস্য সংখ্যা	অনুমোদিত ইউনিয়ন	সদস্য সংখ্যা	অনুমোদিত ইউনিয়ন	সদস্য সংখ্যা
১৯৫১	১২৩২	১৫৪৮৫৬৮	৭৩৬	৭৫৮৩১৪	৫১৭	৮০৪৩৩৭	৩৩২	৩৮৪৯৬২
১৯৫৬	৬০৪	৯৩০৯৬৮	৪৮১	৩০৬৯৬৩	১৫৭	২১১৩১৫	২২৩	১৯৫২৪২
১৮৬১	৮৬০	১০৫৩৩৮৬	৮৮৬	৫০৮৯৬২	১৯০	২৮৬২০২	২২৯	১১০০৩৪
১৯৬৭	১৩০৫	১৪১৭৫৫৩	৮০৮	৪৩৩৫৬৪	২৫৮	৪৩৬৯৭৭	১৭০	৯৩৪৫৪

সূত্র: The Gazetteer of India, Volume 3, Edt. Dr. P.N. Chopra, New Delhi, The Director Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Mar 10, 1975, Page 1098.

চটকল শ্রমজীবীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে সর্দারদের প্রভাব ছিল বহুবিস্তৃত। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বেও অন্তত প্রথম দুই দশক চটকলে তাদের প্রভাব ছিল প্রায় অক্ষুণ্ণ। এই পর্বেও শ্রমিকদের মিলে কাজ পাওয়ার জন্য সর্দারদের কিছু টাকা দিতে হত।[৯] আশ্চর্যের বিষয় স্বাধীনতা-উত্তর যুগে মজুরি বৃদ্ধি দাবির জন্য একাধিক ধর্মঘট, বিক্ষোভ শ্রমিকদের দ্বারা দেখা দিলেও সর্দারদের এই অন্যায্য দাবির বিরুদ্ধে কোনো সংগঠিত বিক্ষোভ দেখা যায় না। এখানে তাদের গ্রামীণ জীবনের জমিদার-কৃষকের সম্পর্ক কতটুকু কাজ করেছিল তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে, যদিও অন্যান্য বাধ্যবাধকতা ছিল।

চটকল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল 'গেট বাজার'। মূলত চটকল শ্রমিকদের হপ্তার দিন অর্থাৎ বেতনের দিন মিলের গেট সংলগ্ন অঞ্চলে বসত গেট বাজার। এই গেট বাজারের মূলেও আমরা দেখতে পাই সেই গ্রামে 'হাট বাজারের' অভিজ্ঞতা। এই গেট বাজারে বস্তি সংলগ্ন অঞ্চলের দোকানপাটের তুলনায় কম দামে জিনিসপত্র পাওয়া যেত। এখানে শ্রমজীবীদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত কিছু পাওয়া যেত। শ্রমজীবীরা হপ্তা বা বেতন পাওয়ার পর তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস এই গেট বাজার থেকেই ক্রয় করে নিত। অপরদিকে, লক্ষ করার বিষয়, এই গেট বাজারে বিক্রেতা হিসেবে অনেকক্ষেত্রে ওই মিলেরই শ্রমিক নিযুক্ত থাকত। বহুক্ষেত্রে নিজ সন্তানসন্ততি অথবা বাড়ির অন্য সদস্যকে এক্ষেত্রে নিয়োগ করা হত। সুতরাং এই গেট বাজার চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে। এক বিকল্প অর্থনীতির দিশাও এই গেট বাজার থেকে পাওয়া যেতে থাকে। আজও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে মিল সংলগ্ন অঞ্চলে হপ্তার দিন এই গেট বাজার লক্ষ করা যায়।[১০]

এই পর্বে তাদের জীবনযাত্রার এক স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে সমরেশ বসুর উপন্যাস *যুগ যুগ জীয়ে* ও *বি টি রোডের ধারে* থেকে। মিলের পার্শ্ববর্তী শ্রমিক কোয়াটার্সগুলি (আয়তনে প্রায় ৮ ফুট/৮ফুট) পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য উপযুক্ত ছিল না। অমল দাসের ভাষায় এগুলি ছিল শ্রমিকদের Sleeping room বা রেস্ট রুম মাত্র। তা ছাড়া মিলে নিযুক্ত প্রত্যেক অভিবাসী শ্রমিকের জন্য পৃথক কোয়াটার্স দেওয়া সম্ভব ছিল না। আবার এই সময় থেকেই কিছু অভিবাসী শ্রমিক গ্রাম থেকে তার পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। উপরোক্ত এ-সমস্ত কারণে চটকলগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একাধিক বস্তি গড়ে ওঠে। এই বস্তিগুলির ঘিঞ্জি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কোনো নরককুণ্ড থেকে কম ছিল না। এই পর্বে এই বস্তির ঘরগুলির আয়তন ছিল প্রায় ৮ ফুট/৮ ফুট; ঘেঁষ চুন ও ইট দিয়ে তৈরি দেওয়াল ও

ছাউনি হিসেবে খোলার বহুল প্রচলন ছিল। ঘরে বাতাস ঢোকার জন্য কোনো জানালা থাকত না। মেঝে ছিল মাটির এবং ঘরের পরিবেশ ছিল স্যাঁতসেঁতে।[১১] তাদের গ্রামীণ জীবনের মুক্ত পরিবেশের চেয়ে এই জীবনের ব্যবধান ছিল দুস্তর। তবু বাঁচার তাগিদে তারা এই জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে।

তাদের সামাজিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হল তাদের খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ। এই সময় তাদের গ্রামীণ জীবনের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে এখানকার খাদ্যাভ্যাসের মিল ছিল লক্ষ করার মতো। পূর্বেই বলা হয়েছে এরা সপরিবার এখানে বসবাস করত না, যদিও ৬০-এর দশকের শেষের দিক থেকে কিছু শ্রমিক সপরিবার এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে। এই সমস্ত শ্রমিকদের জন্য মেসের ব্যবস্থাও ছিল। এই মেসে খাবার খাওয়ার এক মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায় সমরেশ বসুর *বি টি রোডের ধারে* উপন্যাসে। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল বিভিন্ন ধরনের 'লিটি', 'মকওনি', তার সঙ্গে আচার, আলুর চোখা, ছাতু, ভুট্টা, ছোলা ইত্যাদি। তাদের খাদ্যতালিকায় প্রোটিনজাতীয় খাদ্যের অভাব ছিল লক্ষণীয়। এই বস্তিগুলির আশেপাশে একাধিক দেশি মদের ঠেক এবং মদ খাওয়ার ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করার মতো ছিল। পুরুষ ও নারী উভয়ের মধ্যে এটি প্রচলিত ছিল। সমরেশ বসুর উপন্যাসে এ-বিষয়ে এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়।[১২] পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও এদের জীবনে গ্রামীণ প্রভাব একেবারে মুছে যায়নি। পুরুষেরা ধুতি, গেঞ্জি, পাজামা, জামা ইত্যাদি ব্যবহার করত। কাঁধে থাকত সবসময় গামছা। মহিলারা প্রধানত শাড়িই পরিধান করত এবং সামান্য কিছু অলংকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বাংলার মানুষও ধুতি পরিধান বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করলেও এই অবাঙালি ও বাঙালিদের ধুতি পরিধানের স্টাইল বা ধরন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র।

একদিকে চটকল বস্তিগুলোর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অন্যদিকে অপুষ্টিকর খাবার ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে দুরারোগ্য রোগের প্রাদুর্ভাব এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই সময় তাদের জন্য না ছিল ইএসআই (Employees' State Insurance)-এর ব্যবস্থা, না ছিল সরকারি সুলভ চিকিৎসালয়। ফলে অনেকক্ষেত্রে রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের গন্তব্যস্থল ছিল মৃত্যু। *বি টি রোডের ধারে* উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গণেশের স্ত্রী দুলারিকে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হতে দেখি। আবার অন্য এক চরিত্র ফুলকি তো খুব অল্পবয়সেই রোগের প্রকোপে মারা যায়। অন্যদিকে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস না করায় এদের জীবন ছিল বিশৃঙ্খল, যার প্রভাব পড়ে সামাজিক সম্পর্কের ওপর। গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার দরুন জানা যায় বামপন্থী সরকার গঠনের প্রথম দিক পর্যন্ত এখানে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বেশ্যালয় ছিল।[১৩] মূলত এই চটকল অঞ্চলগুলিতে একসময় বেশ্যাবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সম্ভবত

সপরিবারে এখানে বসবাস না করার দরুনই এ ধরনের অপরাধের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এটা তাদের সামাজিক জীবনের একটি দিক মাত্র। তাদের সামাজিক জীবনে শুধুই অস্থিরতা ছিল, একথা ভাবা ভুল। একটি সুস্থ সামাজিক সম্পর্কের ইঙ্গিতও মেলে *বি টি রোডের ধারে* উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র দুলারি ও গণেশের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যেখানে গণেশ তার স্ত্রী দুলারিকে এতই ভালোবাসে যে তার স্ত্রী দুলারি মরে গেলে তার জীবনে বেঁচে থাকার কোনো কারণ থাকবে না বলে অভিমত প্রকাশ করে। তার ভাষায় 'আর ও আজ মরতে বসেছে এখানে আমি কার উপর শোধ তুলব। কার উপর? তাই ভেবেছিলাম আমিও মরব... মরব ওর সঙ্গে।'[১৪]

চটকল শ্রমজীবীদের আর্থসামাজিক জীবনের পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধারা লক্ষ করা যায় মূলত ৭০ ও ৮০-র দশকে। এই সময় থেকে এই চটকল শ্রমিকদের দ্বৈতসত্তার অবসান ঘটতে থাকে বিভিন্ন কারণে, যেমন—দীর্ঘদিন বাংলায় থাকার দরুন চাষবাসের প্রতি অনীহা, গ্রামের চাষের জমির ওপর ক্রমশ ভাগিদারি বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে এরা সপরিবারে বাংলায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। অন্যদিকে বামপন্থী আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি বাংলায় এই শ্রমজীবীদের অধিকারকে নিরাপত্তা প্রদান এদের সামাজিক জীবনে স্থিরতা নিয়ে আসে।

৭০-এর দশক থেকে যারা সপরিবার এখানে বসবাস করতে শুরু করে তারা কোয়াটার্স-এর পরিবর্তে মিল নিকটবর্তী বস্তিতে আশ্রয় নেয়। তবে এই বস্তিগুলির চরিত্র বদলে যেতে থাকে। বস্তির ঘরগুলি তৈরিতে ঘেঁষ-চুনের স্থলে সিমেন্ট-বালি প্রয়োগ হতে থাকে। অন্তত দেওয়ালের বাইরের অংশে সিমেন্ট-বালির প্রলেপ থাকত। মেঝে পাকা না হলেও ইট বিছিয়ে মাটির প্রলেপ দিয়ে সোলিং করা হত। বস্তিগুলির পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা উন্নত করা হতে থাকে। বস্তিতে এক থেকে দুটো খাটা পায়খানা থাকত, যা বস্তির সকলে ব্যবহার করত। স্থায়ীভাবে সপরিবার এখানে বাস করার জন্য একটি সংসারী জীবনে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস কিনতে শ্রমিকেরা বাধ্য হয়। যার ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থায়ী বাজার ও দোকানপাটের বিস্তার ঘটে।[১৫]

সপরিবারে বসবাসের ফলে তাদের রান্নাঘরেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। যারা এখানে সপরিবারে থাকত না তাদের জন্য মেসের ব্যবস্থা তখনও ছিল, তবে ৮০ দশকের শেষের দিকে এই মেসের জায়গা স্থানীয় ছোট-ছোট ঢাবা নিতে থাকে। অন্যদিকে সপরিবারে বসবাসকারী শ্রমিকদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন দেখা যায়। লিটি, মওকনি-র বদলে রুটি এবং ভাত খাদ্যতালিকায় স্থায়ী জায়গা পায়। বিভিন্ন ধরনের ছাতু তখনও জনপ্রিয় ছিল। মাছ, মাংস ক্রমাগত তাদের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, যদিও হপ্তা বা বেতনের দিনই এই প্রোটিনজাতীয় খাবার তাদের খাদ্যতালিকায় স্থান পেত। উক্ত

সময়পর্বে বস্তি এলাকায় মদের ঠেকও বৃদ্ধি পায়। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বস্তি এলাকা ঘুরে দেখলে আজও এই দেশি মদের ঠেক নজরে পড়ে।[১৬] মদ খাওয়ার প্রচলন পুরুষদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। গৃহস্থ নারীরা মদ না খেলেও কর্মরত নারী বিশেষত যারা পরিবারভুক্ত না থেকে একক জীবনযাপন করত তারা মদের নেশায় আসক্ত ছিল। তাদের পোশাক-আশাকে বিরাট পরিবর্তন না এলেও পুরুষদের মধ্যে ধুতির চল ক্রমশ হ্রাস পায় এবং প্যান্ট-শার্টের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। নারীদের পরিধানে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি স্থান পায়।

বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করায় সর্দারদের ওপর এদের নির্ভরতা ক্রমশ কমতে থাকে। অন্যদিকে রাজ্যে শ্রমিকদরদি বামপন্থী সরকার গঠনের ফলে এদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। ধর্মঘট, আন্দোলনের মাধ্যমে ইএসআই-এর সুবিধা আদায় করা হয়। ফলে দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুর হার কিছুটা হলেও কমে। সপরিবারে বসবাসের ফলে সামাজিক জীবনেও স্থিরতা ফিরে আসে। যৌন অপরাধের মাত্রা কমতে থাকে। 'যৌনপল্লি' নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমিত হতে থাকে এবং সমাজে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। মজুরি বৃদ্ধির ফলে পুষ্টিকর খাবার খাদ্যতালিকায় স্থান পায়। ফলে অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর হার কমতে থাকে।[১৭]

স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস করায় এবং গ্রামের চাষবাস থেকে অর্জিত বিকল্প আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চটকল শ্রমজীবীদের আয়ের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় এই চটকল। ফলে মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ১৯৩৭-এর জঙ্গি আন্দোলনের পর প্রায় নিষ্ক্রিয় বামপন্থীরা ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। তাদের প্রভাব এই চটকল শ্রমজীবীদের ওপর দিনে-দিনে বাড়তে থাকে। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শক্তিরা এই চটকল শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে একাধিক ধর্মঘট।[১৮] এই ধমর্ঘটগুলি সফল হলে তাদের মজুরির বৃদ্ধি ঘটে। এই সময় পর্বতে তাদের মজুরির এক রূপরেখা পাওয়া যায় ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত *এক বর্ণ মিথ্যে নয় এবং...* নামক উপন্যাসে। তাঁর ভাষায়—অভয়ের মনে পড়ল সে যখন ১৯৭৯ সালে চাকরিতে জয়েন করে তখন তার বেসিক এবং ডি.এ. দুই ছিল ২৬২.৫০ টাকা। আর ভট্টাচার্য কমিশন দয়ায় পে স্কেল একটা হয়েছিল বটে তবে তাতে লাভ খুব একটা হয়নি। তবে হ্যাঁ, আগে পে স্ট্রাকচার বলে কিছু ছিল না। এখন সেটা হয়েছে। মাইনে যেটুকু বেড়েছে তা ওই মহার্ঘ ভাতা ডি.এ.-এর দৌলতে। বাম রাজত্বে জুটমিল শ্রমিকদের এখন বাড়ি ভাড়াও মিলছে, যা আগে ছিল না।[১৯]

১৯৮৪-তে চটকল শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে আর-এক বড় ধর্মঘট সংঘটিত হয় ৮৪ দিনের জন্য। এক ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে এই

ধর্মঘটের অবসান ঘটে। সমঝোতা অনুসারে প্রত্যেক শ্রমিকের ৬৫ টাকা মজুরি বৃদ্ধি ঘটে, মহার্ঘ ভাতা ৫.৬০ টাকা বাড়ে এবং এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত হয়ে মোট পারিশ্রমিকের বৃদ্ধি ঘটে ৭৬.৬০ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পর্বে চটকল শ্রমজীবীরা তাদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে সংগঠিত ভাবেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে; শুধু তাই নয় তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ও করে নিতে থাকে।[২০]

৭৭-এ বামপন্থীদের ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে মিলগুলিতে ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি সর্দারদের প্রভাবকে অনেকটা হ্রাস করে। তা ছাড়া শ্রমিকরা এখানে স্থায়ী বসবাস করতে থাকায় তাদের জীবনে সর্দারদের ভূমিকা অনেকটাই কমে আসে। যদিও মিলে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও কাজ বিতরণের দায়িত্ব তখনও তাদের হাতেই ছিল। কিন্তু এসময় থেকে সর্দারদের স্বাধীনতা-পূর্ব বা স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম দুই দশকের সেই কঠোর প্রভাব আর থাকল না।[২১] আবার একদিকে ষাটের দশক থেকে ক্রমবর্ধমান জঙ্গি আন্দোলন ও পরবর্তী কালে বামফ্রন্টের ক্ষমতা দখল, শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠনের ফলে শ্রমিক আন্দোলন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে চটের চাহিদা হ্রাস, পলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে যাওয়ায় মিল বন্ধ, ছাঁটাই ও কাজের সময় হ্রাস ইত্যাদির ফলে শ্রমিকদের রোজগারে আঘাত লাগে। চটকল ক্রমাগত রুগ্‌ণ থেকে রুগণ্‌তর শিল্পে পরিণত হতে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক জীবনে অনিশ্চয়তা এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় যে সমস্ত শ্রমিক এখানে স্থায়ী বসবাস শুরু করেছিল তাদের জীবনে এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এক বিরাট প্রভাব ফেলে, শুরু হয় বিকল্প রুজির খোঁজ। প্রথম পর্বে গেট বাজারের মধ্য দিয়ে এই বিকল্প পেশা দানা বাঁধলেও তা পরিণত ও বর্ধিষ্ণু রূপ ধারণ করে দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ ৭০ ও ৮০-র দশকে। এই সময় শ্রমিকদের পরিবারের মহিলা ও শিশুরা নানা ধরনের কুটিরশিল্পে নিযুক্ত হতে শুরু করল। আজও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই চটকল অধ্যুষিত অঞ্চলে একাধিক কুটির শিল্পের উপস্থিতি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। রাখি তৈরি, পুঁতি ও শোলার মালা তৈরি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্পে শ্রমিক পরিবারের সদস্যরা নিযুক্ত থাকত। আবার কোনো কোনো শ্রমিক মিলে কাজ করার পাশাপাশি ছোটখাটো ব্যবসা, দোকানপাট চালাতে থাকে যাতে মিল বন্ধের সময় তাদের অর্থনৈতিক জীবনে আঘাত না লাগে। এমনকি মিল বন্ধ হলে এই চটকল শ্রমজীবীরা রিকশাও চালাত। চটকল বন্ধের ফলে বছরে কিছু নির্দিষ্ট দিনের জন্য এই শ্রমিকদের জীবনে দেখা যেত অনিশ্চয়তা, যার প্রতিফলন ঘটে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে। এই শ্রমজীবীদের সন্তানসন্ততিদের খুব অল্পবয়স থেকেই পড়ালেখা ছেড়ে দোকানপাটে কাজ করতে হচ্ছিল ও হচ্ছে, ফলে এদের শৈশব হারিয়ে যায় সংসারের অভাব অনটনে।[২২]

৭০-এর দশকে চটকল শ্রমিকদের মাইনে বৃদ্ধি ঘটলেও তা ওই সময়কার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে ঘটেনি। ফলে তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস সস্তায় কিনতেই ইচ্ছুক থাকত। গেট বাজার তাদের কাছে একমাত্র সস্তা বাজার ছিল তাই 'পনরাইয়া' অর্থাৎ হপ্তার দিন এরা তাদের সাংসারিক জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখান থেকেই ক্রয় করত। এই পর্বে এই বাজারের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। প্রথমেই উল্লেখ করেছি এই গেট বাজারে বিক্রেতা হিসেবে অনেক সময় মিলেরই কিছু শ্রমিককে নিযুক্ত থাকতে দেখা যেত। মিল বন্ধ থাকাকালীন এই শ্রমিকেরা স্থানীয় বাজারে তাদের জিনিসপত্র বিক্রির দ্বারা এক বিকল্প উপার্জনের পথ খুলে রাখত।[২৩]

সুতরাং দেখা যায় ৭০-এর দশকে বামপন্থী আন্দোলনের ফলে চটকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ঘটলেও, চটকল জীবনে অনিশ্চয়তা চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে এক নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা এক বিকল্প পেশার খোঁজে ধাবিত হয় যার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন ঘটে ৯০-এর দশক থেকে। এর ফলে তাদের শ্রেণিচরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তারা চটকলের সুসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণি থেকে ক্রমশ অসংগঠিত শ্রমিকশ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে তাদের ইউনিয়নের ক্ষমতারও হ্রাস ঘটতে থাকে। ফলে সংগঠিত পথে তাদের দাবি তুলে ধরা ও তা আদায়ের জন্য সংগ্রামের পথে হাঁটাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বামপন্থীদের আপসহীন সংগ্রামের পথ ছেড়ে সমঝোতা বা 'সেটিং'-এর রাজনীতি গ্রহণ, যা এদের সংগ্রামী চরিত্রকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু করতে থাকে। স্বাভাবিক ভাবে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় ৯০-এর দশকে বিশ্বায়নের যুগে।[২৪] এ প্রসঙ্গে আমরা ৫০০টি পরিবারের একটি পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করতে পারি।

সারণি ২: বাসস্থান (২০১৫-১৬)

বসবাসের ধরন	বাসস্থানের ধরন								মোট	
	নিজস্ব বাড়ি		মিল কোয়ার্টার		ভাড়া বাড়ি		অন্যান্য			
	নং	শতাংশ	নং	শতাংশ	নং	শতাংশ	নং	শতাংশ		
সপরিবারে	১৭৭	৪১.৩	৯৯	২৩.১	১৫২	৩৫.৪	১	০.২	৪২৯	১০০
একাকী	৪	৫.৬	৪০	৫৬.৪	২৭	৩৮.০	০	০	৭১	১০০
মোট	১৮১	৩৬.২	১৩৯	২৭.৪	১৭৯	৩৫.৮	১	০.২	৫০০	১০০

সূত্র: Jute Mill Workers of West Bengal: A situational analysis towards enhancing their well-being, Riddhi Foundation, Study Sponsored by National Jute Board, 2017, p. 40.

চটকল শ্রমজীবীদের আর্থসামাজিক জীবনে পরিবর্তনের তৃতীয় ধারা লক্ষ করা যায় বিংশ শতকের শেষ ও একবিংশ শতকের প্রথম দশক অর্থাৎ ১৯৯০-২০১১ পর্যন্ত সময়কালে। এই পর্বে পরিবর্তনের গতি ছিল দ্রুত ও বৈচিত্র্যময়। প্রথম পর্বে শ্রমিকেরা সপরিবারে ভাড়া ঘরে বাস করলেও দ্বিতীয় পর্ব থেকে তাদের মধ্যে অনেকে এই বস্তি এলাকায় জমি ক্রয় করে নিজস্ব ঘর তৈরি করতে থাকে, তৃতীয় পর্বে এই মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময় চটকল বস্তিগুলির চরিত্র আমূল পরিবর্তিত হয়। ৯০ দশকের মাঝামাঝি স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে বামপন্থী সরকার বস্তিগুলি থেকে খাটা পায়খানাগুলি তুলে দেয়। বস্তিগুলি ক্রমে নগরের চরিত্র ধারণ করে, পয়ঃপ্রণালী উন্নত হয়। গারুলিয়া, ভাটপাড়া, নৈহাটি, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া, টিটাগড় প্রভৃতি অঞ্চলে এই অবাঙালি চটকল শ্রমজীবীরা জমি ক্রয় করে স্থায়ী বসবাস করতে থাকে। এই পর্বে তাদের বসবাসের বাড়িঘর পূর্বের তুলনায় উন্নততর। দেওয়াল বালি-সিমেন্টে তৈরি, পাকা মেঝে, ছাউনি হিসেবে টালির ব্যবহার থাকলেও অ্যাসবেসটস বা পাকা ছাদও নজরে পড়ে। ৯০-এর দশকের শেষের দিকে এদের ঘরে-ঘরে টিভি, পাখা ও অন্যান্য বিনোদনের জিনিসপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একবিংশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক শ্রমজীবীদের বাড়িতে মোবাইলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[২৫]

সারণি ৩: চটকল শ্রমিকদের মালিকানাধীন গৃহস্থালী সম্পদ (২০১৫-১৬)

সম্পদের ধরন	প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে এমন বাড়ির সংখ্যা	হ্যাঁ		না	
		নং	শতাংশ	নং	শতাংশ
টিভি সেট	৫০০	৩৪৪	৬৮.৮	১৫৬	৩১.২
রেফ্রিজারেটর	৫০০	৬৮	১৩.৬	৪৩২	৮৬.৪
টেলিফোন/মোবাইল	৫০০	৪৭৪	৯৪.৮	২৬	৫.২
সাইকেল	৫০০	২৮২	৫৬.৪	২১৮	৪৩.৬
মোটরসাইকেল/স্কুটার	৫০০	১৭	৩.৪	৪৮৩	৯৬.৬
গাড়ি/জিপ	৫০০	১	০.২	৪৯৯	৯৯.৮
কম্পিউটার	৫০০	৫	১.০	৪৯৫	৯৯.০
ইন্টারনেট সুবিধা	৫০০	৫	১.০	৪৯৫	৯৯.০
সেলাই মেশিন	৫০০	৬৪	১২.৮	৪৩৬	৮৭.২
বৈদ্যুতিক জল পরিশোধক	৫০০	২	০.৪	৪৯৮	৯৯.৬

সূত্র: Jute Mill Workers of West Bengal: A situational analysis towards enhancing their well-being, Riddhi Foundation, Study Sponsored by National Jute Board, 2017, p. 60.

এদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও এই পর্বে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ভাত ও রুটি প্রধান খাদ্যের তালিকায় স্থান পায় ও ছাতু, ভুট্টা, লিট্টি, মকওনির প্রচলন প্রায় অবলুপ্ত হয়। মাছ-মাংস খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে এদের আর সপ্তাহর দিন বা বেতনের দিনের অপেক্ষা করতে হয় না। দেশি মদের পাশাপাশি বিদেশি মদের প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এই পর্বে মদ খাওয়ার প্রচলন নারীদের মধ্যে আর লক্ষ করা যায় না। এর একটা কারণ হল চটকলগুলিতে নারীশ্রমিকের সংখ্যা ক্রমাগত কমতে থাকা। অল্পবিস্তর যারা মিলে কাজ করত তাদের আর্থসামাজিক জীবনেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে। এদের পোশাক-আশাকেও স্থানীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পুরুষদের মধ্যে ধুতির প্রচলন প্রায় অবলুপ্ত হয়। যুবক- যুবতিদের মধ্যে আধুনিকতার ছাপ লক্ষ করা যায়। পুরুষদের পোশাকে প্যান্ট-শার্ট, জিন্‌স-এর আধিক্য নজরে পড়ে। মেয়েদের মধ্যেও শাড়ির পাশাপাশি কুর্তি, পাজামা, চুড়িদার, জিন্‌স ইত্যাদির প্রচলন বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে ভোজপুরি লোকগীতির উল্লেখ করা যেতে পারে 'ফ্যাশন ম্যা আঁকে দুনিয়া ভুলানি জি' যেখানে তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।[২৬]

দুনিয়া ফৈশন মেঁ আইকে ভুলানী জী।
আঁখিয়া অজত উ লখাওয়ে ঢকনা।
ওকর মুহঁওয়া রুমাল সে পোছানী জী।
মুড়িয়া পর অপনা রখাওয়ে ঝোঁটওয়া।
ওকর আধী আধী মোছিয়া মুড়ানী জী।
পৈন্টওয়া কে ফন্দ মেঁ লগাওয়ে গোড়য়া।
লঘু সংকা কে বহাওয়ে ঠাঢ়ে পানী জী।
দুনিয়া ফৈশন মেঁ আইকে ভুলানী জী।

৯০-এর দশক থেকে চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক চরিত্রের পরিবর্তনের প্রভাব তাদের সামাজিক জীবনেও লক্ষ করা যায়। এরা ক্রমে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকে। বস্তিগুলির ক্রমে নগরে পরিণত হয়ে যাওয়ায় স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। নগরপালিকার দিক থেকে চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে কম খরচে শ্রমিকেরা সেবা পায়। এতৎসত্ত্বেও উক্ত অঞ্চলে শ্রমিকদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকতে দেখা যায়। চটকল শ্রমিকদের প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ইএসআই-এর পক্ষ থেকে বেলুড়ে যক্ষ্মারোগের জন্য এক বড় হাসপাতালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার স্থায়ী বাসিন্দা রূপে বাংলায় বসবাস করায় তাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন অনেকটা স্বাভাবিক রূপ নিয়েছে। যৌন অপরাধ

কমেছে। এই চটকল অঞ্চলগুলি থেকে দূরে কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় বেশ্যালয় নজরে এলেও, বস্তি অঞ্চলে তা এখন অনুপস্থিত।[২৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে চটকল শ্রমজীবীদের জীবনে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে যে স্থবিরতা ছিল, তা ভাঙতে শুরু করে। প্রায় ১০০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল বাংলাকে নিজ বাসস্থান ভাবতে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে এই বাংলাই তাদের বাসস্থান, আবার অনেক শ্রমিক পরিবার তো দুই-তিন প্রজন্ম থেকে তার আদি গ্রামের মুখ দেখেনি, তারা বাংলাকেই তাদের নিজ বাসস্থান বলে মনে করে।

১৯৯০-এর দশক চটকল অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে কেন্দ্রের নরসিমা রাও-এর সরকার দেশের আত্মনির্ভর আর্থিক ও শিল্পনীতিকে বিসর্জন দিয়ে ঘোষণা করে নয়া অর্থনীতি, বিশ্বায়ন তথা উদারিকরণের নীতি। এই নতুন নীতির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল ভারতের শ্রমিকশ্রেণি। এক্ষেত্রে বাংলার চটকল শ্রমিকরা ব্যতিক্রম হয়নি। ভারতের বাজার বিশ্বের কাছে উন্মুক্ত হলে 'পরিমার'-এর ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটে। পাটজাত শিল্পে মন্দা নেমে আসে। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়—'অভয় ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছে, এক সময় পশ্চিমবাংলায় মিলের সংখ্যা ছিল ১০৫। আর কমতে কমতে বর্তমানে সংখ্যাটি ৫৫। তার মধ্যে রোটেশন সিস্টেমে মিল বন্ধ-খোলার খেলায় মোটামুটি গোটা ৪০টি খোলা থাকে। একই মালিকের একাধিক মিল থাকায় মালিকদের কোনো ক্ষতি না হলেও শ্রমিক এবং তাদের পরিবার একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। তার মধ্যে স্থানীয়দেরই নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হয়।'[২৮] সুতরাং ৯০-এর দশক থেকেই এই চটশিল্পে মন্দাভাব বৃদ্ধি পায়, যার ফলে চটকল শ্রমিকদের জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ঘোরতর হয়।

চটকল শ্রমিকদের জীবনে এই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ৯০-এর দশক থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিকল্প পেশার অনুসন্ধানের পাশাপাশি তাঁরা নিজেদের পরিবারকে দু-বেলা খাবার জোগানোর জন্য অদ্ভুত সব উপায় বার করতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা জরুরি। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বছরের নির্দিষ্ট কিছুদিন বিভিন্ন কারণে চটকলগুলি বন্ধ থাকে। আবার অনেক সময় ইউনিয়ন ও সুপারভাইজারের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেও মিলে লকআউট হতে থাকে। এমতাবস্থায় কিছু শ্রমিক মিল বন্ধ হওয়ার আগেই সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ক্ষেত্রসমীক্ষার দরুন এমনও দেখা গেছে একজন সুস্থ শ্রমিক হাতের আঙুলে অজ্ঞান করার ইঞ্জেকশন নিয়ে তাতে নিজেই বা অন্য কোনো বন্ধুকে দিয়ে আঘাত করে দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়ে পড়ে

'এক্সিডেন্টাল লিভ' নেওয়ার জন্য।[২৯] ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের *এক বর্ণ মিথ্যে নয় এবং...* উপন্যাসেও এই ধরনের উল্লেখ মেলে। উল্লেখিত উপন্যাসে আহমেদ আলি সম্পর্কে অভয়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—'ও এক চোখে খুব ঝাপসা দেখে। কানা বললেই হয়। তবে ওর চোখে কম দেখার কারণ ও নিজেই। অভয় শুনেছে, এক বড় কোম্পানিতে লকআউট হবে খবর শুনে হসপিটালে ভর্তি হওয়ার জন্য নিজেই নিজের চোখে মেকানিক শপের তেল লাগিয়ে দেয়। চোখ জ্বলতে থাকে তার। তারপরেই হাসপাতাল, ডাক্তার, ছুটোছুটি, অপারেশন, বোর্ড বসানো ইত্যাদি। পরবর্তীতে সে মেকানিক ডিপার্ট থেকে বদলি হয়ে সেলাই ঘরের কাজে লাগল। উপরি পাওনা হল ই. এস. আই. থেকে প্রতিমাসে "পার্মানেন্ট ডিসএবিলিটি বেনিফিট"।[৩০] সুতরাং বিশ্বায়নের যুগে যখন এক শ্রেণি আর-এক শ্রেণির ওপর তীব্র শোষণ চালায়, যখন বামপন্থী নেতারা সমঝোতার পথে হেঁটেছে তখনও কিন্তু এই শ্রমজীবীদের জীবনের সংগ্রাম থেমে যায়নি। তারা এই নির্মম শোষণের যুগেও বেঁচে থাকতে চায় এবং বেঁচে থাকার জন্য অনুসন্ধান করতে থাকে একাধিক উপায়। তাই ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ 'এক্সিডেন্টাল লিভ'ও তাদের কাছে ছিল সপরিবারে দু-বেলা খেয়ে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা।

বিশ্বায়ন, উদারিকরণ ও তথাকথিত সংস্কারের নীতি গ্রহণের ফলে শ্রমশক্তির ঠিকাদারিকরণ ও অস্থায়ীকরণ এখন চটশিল্পের একটা স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে। পার্মানেন্ট শ্রমিকের জায়গায় ক্যাজুয়াল শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হতে থাকে। এই ধরনের শ্রমিকদের ইএসআই, পিএফ, ডিএ প্রভৃতি শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৩১] ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'বর্তমানে জুটমিলগুলোর হাতবদল শুরু হয়েছে। যারা কিনেছে তারা সব আগে কাঁচা পাটের দালালি করত। কাজেই ওরা মালিক হওয়ায় জুটমিলের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা। এরা নিয়ম নীতি মানবে না।'[৩২] স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় উক্ত পরিস্থিতিতে চটকল শ্রমজীবীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাদের অর্থনৈতিক জীবনে অস্থিরতা দেখা যায়। এই অস্থিরতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য চটকল শ্রমিকদের আপ্রাণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় তাদের বিকল্প অর্থনীতির প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে।

চটকল শ্রমিকদের আর্থসামাজিক জীবনে ইতিপূর্বে যে সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, তা এই পর্বে গভীর থেকে গভীরতর হয়। সর্দারদের প্রভাব ও ক্ষমতা ইতিপূর্বে ক্ষীণ হয়েছিল, তা পর্বে আরও হ্রাস পায়। এই সময় তাদের অর্থনৈতিক জীবনে যে বড় পরিবর্তন দেখা যায়, তা হল, বিকল্প পেশার প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি। পূর্বেই বলা হয়েছে বিভিন্ন কারণে চটশিল্পে ভাটা নেমে আসে। এই পর্বে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। বছরে নির্দিষ্ট কয়েকমাস প্রায় মিল বন্ধ থাকতে আরম্ভ করে। তা ছাড়া বৃদ্ধি পায় কাজের

সময় হ্রাস, লকআউট ইত্যাদি। যার ফলে চটকল শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনে অনিশ্চয়তা লেগেই থাকে। এই অনিশ্চয়তা থেকে বাঁচার জন্য তারা খুঁজতে থাকে বিকল্প পথ। ৭০ ও ৮০-এর দশকে কুটিরশিল্পের মধ্য দিয়ে এই চটকল শ্রমজীবীদের পরিবার তাদের অর্থনৈতিক জীবনের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে বিকল্প পথ খোঁজার চেষ্টা করে তা এ পর্বে সুস্পষ্ট রূপ নেয়। এই সময় নিজ পরিবারের অর্থনৈতিক সুস্থিতি বজায় রাখার জন্য চটকলে কর্মরত ব্যক্তির পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য চটকল বহির্ভূত অন্য কোনো কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে, যেমন— কলসেন্টার, কলকাতায় বেসরকারি অফিস, দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ গারুলিয়ার ওড়িয়াপাড়া রোডের বাসিন্দা ও তেলিনিপাড়া ভিক্টোরিয়া জুটমিলে কর্মরত শ্রমিক দিনেশকুমার প্রসাদের কথা বলা যায়, যিনি তিন পুরুষ ধরে এখানকার বাসিন্দা। চার সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে তাঁর সংসার। তিনি মিল বন্ধের সময় পরিবার চালনোর জন্য ফুচকা বিক্রি করেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরা তাঁকে সাহায্য করে। আবার অন্য এক ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায়, গারুলিয়া বাঁশবাগান নিউ কলোনির বাসিন্দা শম্ভু গুপ্তা যিনি তেলেনিপাড়া ভিক্টোরিয়া জুটমিলেই কর্মরত, তাঁর ছেলে দিপেশ গুপ্তা কলকাতায় বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে। সম্ভবত মিলের অনিশ্চিত জীবন থেকে বাঁচার জন্যই তাঁর ছেলে কলকাতামুখী হয় এবং অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে এ ধরনের একাধিক উদাহরণ নজরে পড়ে, যা এই চটকল অর্থনৈতিক জীবনে এক বিরাট পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।[৩৩]

সারণি ৪: স্ট্রাইক ও লকআউটের সালতামামি

সাল	স্ট্রাইক				লকআউট			
	সংখ্যা	মোট শ্রমিক	মোট কর্মদিন	গড়দিন	সংখ্যা	মোট শ্রমিক	মোট কর্মদিন	গড়দিন
১৯৯০	—	—	—	—	২১	৬৫৮০০	৮১৭২৪০০	১২৪.২
১৯৯১	—	—	—	—	১৮	৭৩২৬৩	৫৮১৩১৩৩	৮০.০
১৯৯২	৯	১৭৪৩৩৫	৮৩২৬৬০৫	৪১.২	১৮	৭০৬৫০	৭৫৩৭১০০	৮৬.৪
১৯৯৩	২	৫০০০	৫০০০০	—	২৪	৮৬০০০	৭৫২০০০০	—
১৯৯৩	—	—	—	—	১৭	৬৮০০০	৮৪৫০০০০	—
১৯৯৫	১	২২৫০০০	৯০০০০০	—	১৬	৪৮০০০	১৯১০০০০	—
১৯৯৬	২	৫০০০	৭০০০০	—	২২	৮১১০০	৪৪৪০০০০	—
১৯৯৭	৩	৫০০০	১৬০০০০	—	১২	৪৪০০০	১৯১০০০০০	—

সূত্র: পাট শিল্প ২০০১, সংকট ও সমাধানের উৎস সন্ধানে, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, নাগরিক মঞ্চ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ৫।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে চটকল শ্রমজীবীদের বৈচিত্র্যময় আর্থসামাজিক জীবনে নজরে পড়ে। স্বাধীনতা-পূর্বে চটকল শ্রমজীবীরা এক পূর্ণ সর্বহারাশ্রেণির রূপ নিতে ব্যর্থ হয়। এই সময় তাদের 'Dual chracter' অর্থাৎ অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক চরিত্র প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে এই অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক শ্রেণি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সর্বহারা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণিতে উত্তরণের পথে ধাবিত হলেও ৯০-এর দশকে বা তারও আগে থেকে তাদের অর্থনৈতিক জীবনে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চটকলের এই সর্বহারা সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণি ক্রমে অসংগঠিত শ্রমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে যারা মনে করতেন এই অর্ধ-কৃষক–অর্ধ-শ্রমিক শ্রেণি ক্রমে সচেতন ও শ্রেণিসংগ্রামে দীক্ষিত এবং সংগঠিত হয়ে সর্বহারা বিপ্লব করবে, বর্তমান পরিস্থিতি এই ধারণার পরিপন্থী। বিশ্বায়নের নামে উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণের ফলে এই চটকলের সংগঠিত শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে অথবা মিল জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুন ক্রমাগত অসংগঠিত শ্রমিকে পরিণত হতে থাকে। চটকল শ্রমজীবীদের আর্থসামাজিক জীবনে এই পরিবর্তন তাদের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করে।

তথ্যসূত্র

১। B. Foley, *Report on Labour in Bengal*, Calcutta, 1906.

২। অমল দাস, 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের ওপর সর্দারি প্রভাব (১৮৭৫-১৯২০)', *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩, পৃ. ১০১-১০৮।

৩। Dipesh Chakravarty, *Rethinking Working-class History: Bengal 1890-1940*, 1989, p. 121.

৪। অমল দাস, 'বাংলার চটকল শ্রমিকদের চটকল বহির্ভূত জীবন (১৮৭০-এর দশক থেকে ১৯২০-র দশক)', *অনুসন্ধানে শ্রমিক ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১৩, পৃ. ১১২।

৫। Curjel, *Women Labour in Bengal Industries; bulletins of Indian Industry and Labour*, No. 31, a Government of India Publication, Calcutta, 1923, p. 6.

৬। A. Joshi and V.K. Goel, Working Paper No. 40, *Indian Jute Industry and Trends in the Exports of Jute Manufacturers*, Giri Institute of Development Studies, Lucknow, undated, pp. 3 and 10.

৭। অমল দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০।

৮। *The Gazetteer of India*, Volume 3, Edt. Dr. P.N. Chopra, New Delhi, The Director Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Mar 10, 1975, Page 1098.

৯। অমল দাস, *প্রাগুক্ত*।

১০। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ ০৫/০৪/২০১৭, দ্রষ্টব্য: শত্রুঘ্ন কাহার, 'স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে চটকল শ্রমিকদের সামাজিক জীবনে বিবর্তনের ধারা, সমীক্ষায় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল (১৯৪৭-২০১১)', *ইতিহাস এষণা ২*, সিদ্ধার্থ গুহরায় সম্পাদিত, কলকাতা, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ১৯৫।

১১। শত্রুঘ্ন কাহার, *প্রাগুক্ত*।

১২। সমরেশ বসু, *বি টি রোডের ধারে*, কলকাতা, দশম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ১৯-২১।

১৩। সাক্ষাৎকার: নিমাই সাহা, ফরওয়ার্ড ব্লক কাউন্সিলর, গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি, বয়স আনুমানিক ৬৫, তারিখ ০৫/০৪/২০১৭।

১৪। সমরেশ বসু, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

১৫। সাক্ষাৎকার: অঞ্জু দেবী, ওয়েভেলি জুট মিলে কর্মরত, গারুলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স আনুমানিক ৪১, তারিখ ০৬/১০/২০১৬।

১৬। শত্রুঘ্ন কাহার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬-৯৭।

১৭। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ ০৫/০৪/২০১৭।

১৮। দীপক দাসগুপ্ত, *এক জুট চটকল শ্রমিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা*, (বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন প্রকাশিত হিন্দি পুস্তিকা), ২০১০, পৃ. ১৫।

১৯। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, *এক বর্ণ মিথ্যে নয় এবং...*, ২০১৬, পৃ. ৩৩।

২০। দীপক দাসগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

২১। Nandini Gooptu, Economic Liberalisation, Work and Democracy, Industrial Decline and Urban Politics in Kolkata, *Economic and Political Weekly*, Mar 26, 2007, p. 1924.

২২। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ ০৫/০৪/২০১৭।

২৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা, ভাটপাড়া, মেঘনা জুট লাইন, তারিখ ০৩/০৪/২০১৬।

২৪। *বিশ্বকর্ম চেতনা পত্রিকা* (বি.এম.এস.-এর মুখপত্র), জ্যোতিবসুর মজদুর সংঘের ভালো উপদেশ, বর্ষ ৮, অঙ্ক ১২, ১৯৯৮, পৃ. ৬।

২৫। *Jute Mill Workers of West Bengal: A situational analysis towards enhancing their well-being*, Riddhi Foundation, Study Sponsored by National Jute Board, 2017, p. 60.

২৬। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ ০৫/০৪/২০১৭। রামবহাল তেওয়ারী, *ভোজপুরি সাহিত্যের ইতিহাস*, ২০১৬, পৃ. ২২৬।

২৭। ক্ষেত্রসমীক্ষা, *প্রাগুক্ত*।

২৮। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।

২৯। সাক্ষাৎকার: রমেশ চৌধুরি, গৌরীশঙ্কর জুট মিলে কর্মরত, গারুলিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স ২৯, তারিখ ০৫/০৮/২০১৬।

৩০। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯-৪০।

৩১। পাট শিল্প ২০০১, *সংকট ও সমাধানের উৎস সন্ধানে*, নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা, নাগরিক মঞ্চ, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৫।

৩২। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

৩৩। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গারুলিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল, তারিখ ০৫/০৪/২০১৭। সাক্ষাৎকার: শম্ভু গুপ্তা, তেলিনিপাড়া জুট মিলে কর্মরত, গারুলিয়া বাঁশবাগানের স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স আনুমানিক ৫০, তারিখ ০৫/০৮/২০১৬; সাক্ষাৎকার: দীনেশ পণ্ডিত, ভিক্টোরিয়া জুট মিলে কর্মরত, গারুলিয়া ওড়িয়াপাড়া রোডের স্থায়ী বাসিন্দা, বয়স আনুমানিক ৪৫, তারিখ ০৫/০৮/২০১৬।